ডুয়ার্সে দুই দিন

ফরিদুর রহমান

আকাশে আগে থেকেই মেঘ জমেছিল। আমরা যখন গরুমারা জাতীয় উদ্যানের প্রবেশ পথে পৌঁছলাম তখন টুপটাপ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। লাটাগুড়ির ত্রিমূর্তি রিসোর্ট থেকে গরুমারা মাত্র মিনিট দশেকের পথ। প্রবেশ পথের ডাইনে প্রশাসনিক দপ্তর এবং নিরাপত্তা চৌকি ইত্যাদি মিলিয়ে কিছু ছোট-বড় স্থাপনা। বাঁ দিকে যতো দূর চোখ যায় ঘন সবুজ চা বাগান।

মূর্তি এবং জলঢাকা নদীর পলিমাটিতে আশি বর্গকিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত গরুমারা ডুয়ার্সের সবচেয়ে জনপ্রিয় বনাঞ্চল। এখানে কে কার গরু মেরেছিল অথবা গরুকে বাঘে ধরেছিল, কে জানে! এখন অবশ্য এই বনে বাঘ নেই তবে চিতাবাঘ এবং গরু আছে। এ ছাড়াও এক শিংওয়ালা গন্ডার, হাতি, বাইসন, মালয়ান জায়ান্ট কাঠবেড়ালি, রক পাইথন ইত্যাদিও ছড়িয়ে আছে সারা বনে।

পর্যটকদের প্রবেশের সময় সকালে এবং বিকেলে চারটি ভিন্ন স্লটে ভাগ করা। আমাদের আঠারোজনের দলের সময় বিকেল তিনটা। অরণ্যের গভীরে দেখতে দেখতে যাবার সুবিধার জন্যে ছাদখোলা জিপে দাঁড়িয়ে থাকাটাই নিয়ম। কিন্তু বৃষ্টি এসে শুরুতেই একটা ঝামেলা সৃষ্টি করলো। প্রতিটি জিপে ছয়জন করে ওঠার পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিত্যক্ত লক্কর ঝক্কর মার্কা সবুজ রঙের জিপ ত্রিপলের ছাউনি দিয়ে ঢেকে দিলে দাঁড়ানো তো দূরের কথা জড়োসড়ো হয়ে বসাও কঠিন হয়ে গেল।

কপাল ভালো, কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি ধরে এলো, তবে আকাশের মুখ থমথমে। আমাদের মাথার ওপর থেকে ছাউনি খুলে নিয়ে চলতে শুরু করলে দুপাশের বন ক্রমেই ঘন হতে থাকে। সবুজ ঘাস এবং ঝোপঝাড়ের মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘ গাছের সারি। ফাঁকে ফাঁকে লতাগুল্ম আর সবুজ ফার্নের বিছানায় ছোপ ছোপ রোদ গায়ে মেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে একদল ময়ূর। পাথর ছড়ানো মাটির রাস্তায় মাঝে মাঝে জল জমে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, ঝাঁকুনিটা বয়োবৃদ্ধ জিপের না ছালবাকল ওঠা রাস্তার বোঝা মুশকিল। হঠাৎ করে গতি মন্থর হতে হতে সবগুলো জিপ থেমে গেল। একটা বাইসন বেশ ধীরে সুস্থে রাস্তা পার হচ্ছে। কয়েকটা বক হেলেদুলে চলা বাইসনটিকে ঘিরে উড়তে উড়তে অদৃশ্য হয়ে গেল গভীর জঙ্গলে।

শুনেছিলাম গরুমারায় একশ আশি প্রজাতির পাখির আবাস। কিন্তু বাস্তবে কিছু ময়ূর, কাঠ ঠোকরা, বন মোরগ আর উড়ে যাওয়া বক ছাড়া কিছু চোখে পড়েনি। এই বনে ভেঙে পড়া ডাল পালা, ঝরে পড়া পাতা কিংবা ঝড়ে উপড়ে যাওয়া গাছ সরিয়ে নেওয়ার বা পরিস্কার করার কোনো নিয়ম নেই। প্রাকৃতিকভাবে সব মাটিতে পড়ে পচে গলে মাটিতেই মিশে যায়।

অরণ্যের প্রকৃতি ও পশু পাখি যতোটা সম্ভব কাছে থেকে দেখবার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যে পুরো গরুমারায় রয়েছে আটটি ওয়াচটাওয়ার। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের জিপের বহর যাত্রাপ্রসাদ ওয়াচ টাওয়ারের খোলা চত্বরে এসে দাঁড়ালো। যাত্রাপ্রসাদ নামে কোনো এক মৃত হাতির স্মরণে নির্মিত ওয়াচ টাওয়ার থেকে গরুমারা সংরক্ষিত বনের একটা অংশ বেশ ভালো দেখা যায়। দুই স্তরের যাত্রাপ্রসাদ ওয়াচ টাওয়ারের ঠিক নিচে দিয়ে বয়ে গেছে মূর্তি নদী। নদী যেখানে বাঁক নিয়ে একটা অর্ধবৃত্ত তৈরি করেছে সেখানে নাকি সকাল-সন্ধ্যা বনের পশুরা অন্য কোনো কারণে না হলেও নদীর জল এবং নদী তীরে নুন খেতে সমবেত হয়।

আগে থেকেই কয়েকটা জিপ দাঁড়িয়েছিল, আমরা এসে নামার পরে মানুষের কোলাহলে বনাঞ্চলের নীরবতায় কান পেতে পশু-পাখির ডাক শোনার অবস্থা থাকে না। একটা ছোট্ট সেতু এবং স্বল্প

পরিসর পথ পেরিয়ে আমরা ওয়াচ টাওয়ারের প্রথম স্তরে এসে উঠে পড়ি। কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে প্রথম স্তর থেকে একটু নিচে রেলিং দিয়ে ঘেরা দ্বিতীয় স্তর আর তার নিচে দিয়েই বয়ে যাচ্ছে মূর্তি নদী। দুটি লেভেলে চলছে দর্শনার্থী নারী পুরুষ প্রবীণ ও শিশু মিলিয়ে জনা পঞ্চাশেক মানুষের হৈচৈ আর ছবি তোলার উপযুক্ত জায়গা খুঁজে দাঁড়াবার প্রতিযোগিতায়। এরই মধ্যে আছে চোখে দূরবীন লাগিয়ে দূরে বন্য প্রাণী দর্শনের ব্যর্থ প্রচেষ্টা। একদল বাইসনকে দেখা গেল সল্টপিট থেকে অনেক দূরে ঘাসের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রাণিকূলও কম নিমকহারাম নয়, এতো লবণ খেয়েও কাছের লবণ ঢিপির কাছেও তারা আসেনি।

ফেরার পথে বিকেল পাঁচটা বাজতে না বাজতেই বনের ভেতরে আলো কমে আসতে থাকে। ঘন গাছপালার ফাঁকে শেষ বিকেলের সূর্য মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। কোথাও কোথাও গাছের ডাল থেকে ঝুরি নেমেছে, কোথাও ঝুলছে অর্কিড, ফুটে আছে নানা রঙের অর্কিডের ফুল। গাড়িগুলো সার ধরে চলছিল একই গতিতে। কয়েকটা বনগরু দ্রুত রাস্তা পার হয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল এবং বিস্ময়ের ব্যাপার এবারেও দেখা গেল দু'তিনটি বক পাশাপাশি উড়ে যাচ্ছে।

বনের ভেতরে গন্ডারের দেখা না পেয়ে অনেকেই প্রবেশ পথের বিশাল গন্ডারের মূর্তির সাথে যখন ছবি তোলায় ব্যস্ত তখনই ঘটলো এক বিপত্তি। বৃষ্টি ভেজা চা বাগান থেকে এক দুই করে বেশ কিছু জোঁক এসে পর্যটকদের পা বেয়ে উঠতে শুরু করেছে। এক আতঙ্কিত নারীর চিৎকার প্রায় সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে প্রত্যেকেই নিজ নিজ গা'য়ে-পা'য়ে জোঁকের অস্তিত্ব খুঁজে গলদঘর্ম। ত্রিমূর্তি রিসোর্টে ফিরে যাবার আগে পথের পাশে একটা টং দোকানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে এবং বসে চা খেয়ে যখন চাঙ্গা হবার চেষ্টা করছি তখন বাইরে জমাট অন্ধকার। ত্রিমূর্তির গেস্টরুমগুলোর চারিদিকে ঝলমলে আলো এবং বাগানে গার্ডেন লাইট জ্বলে উঠলেও নিঃসীম নীরবতার মধ্যে কান পাতলেই শোনা যায় ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্টের পরপরই বেরিয়ে পড়লাম বিন্দুর উদ্দেশে। আবারো ডুয়ার্সের বনের পথে দু'পাশে ঘন সবুজ গাছপালা আর লতাগুল্মের ভেতর দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে দাঁড়াতে হলো একটা লেভেল ক্রসিংয়ে। আমাদের ফুটপাথে যেমন লেখা থাকে 'পথচারি পারাপার' তেমনি চালসা রেঞ্জের এই লেভেল ক্রসিংয়ে হাতির ছবি আঁকা সাইন বোর্ডে লেখা 'অ্যানিম্যাল ক্রসিং'। কিন্তু পশুপাখিরা কি সাইনবোর্ডের লেখাটা পড়তে পারবে! একটু পরেই যাত্রীবাহী ট্রেন হুস হুস করে পার হয়ে গেল লেভেল ক্রসিং এবং আমরা আবার গাড়িতে উঠে যাত্রা শুরু করলাম।

পথের পাশে বন-জঙ্গল ছাড়াও অবিরাম ঝরতে থাকা ছোট ছোট ঝোরা আর ঝোপঝাড়ের মধ্যে উঁকি দেওয়া কাঠের বাড়িঘর পেরিয়ে আঁকা বাঁকা

পাহাড়ি পথে ছুটতে থাকে আমাদের বাহন। বিন্দুর পথে যাত্রা বিরতি গাইরিবাস ভিউ পয়েন্টে। ভিউ পয়েন্ট নাম থেকেই অনুমান করা যায় এখানে দাঁড়িয়ে দেখা যাবে পাহাড় নদী মেঘ আর বনভূমির আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্যাবলী। আমরা একটা ইউ টার্নে নেমে আই লাভ গাইরিবাস লেখা ফলকের পাশে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি মেলে দিই অনেক নিচে। সেখানে বয়ে যাচ্ছে ক্ষীণধারা জলঢাকা নদী। নদীর তীরে বিচ্ছিন্ন গ্রামে নানা রঙের বাড়ি ঘর খেলনার মতো দেখায়।

গাইরিবাস থেকে বিন্দুর দূরত্ব এগারো কিলোমিটারের মতো হলেও পাহাড়ি পথে সময় লেগে যায় আধা ঘণ্টারও বেশি। এখানে পাহাড়ের গায়ে গায়ে কমলা বাগান আর এলাচের চাষাবাদ। চলার পথের বাঁকে বাঁকে চোখে পড়ে ছোট্ট সুন্দর রিসোর্ট। রাত্রিবাসের জন্যে হোম স্টে বা গৃহবাসী হবার আমন্ত্রণ জানিয়ে ঝুলছে ব্যানার এবং বিলবোর্ড। এই পাহাড়ি জনপদে ভারী বোঝা মাথায় একটা ফিতায় ঝুলিয়ে পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে পাহাড়ি নারী। পথের পাশে দোকানে চায়ে কাপ হাতে আড্ডা জমিয়ে বসে আছে অলস পুরুষের দল। এইসব দৃশ্য দেখতে দেখতেই আমরা পৌঁছে যাই ট্যুরিস্ট ভিলেজ বিন্দু বাজারে। অনেক দূরে থেকেই কানে আসে অঝোর ধারায় ঝরতে থাকা জলের শব্দ। ভারত-ভুটান সীমান্তে দুই হাজার ফুট উচ্চতায় দার্জিলিং জেলার শেষ গ্রাম বিন্দু। জলঢাকা নদীর উপরে বাঁধ দিয়ে এখানে তৈরি করা হয়েছে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র।

আমাদের গাড়িগুলো যেখানে দাঁড়ালো সেখান ভিউ পয়েন্ট লেখা দিকনির্দেশনা ফলক। ডাইনে নদীর খানিকটা ভেতরে একটা বাঁধানো চত্বর, সেখানে দাঁড়ালেই চোখে পড়ে প্রকৃতির বুকে মানুষের তৈরি প্রতিবন্ধকতায় গড়ে ওঠা বিন্দু হাইড্রোইলেক্ট্রিক পাওয়ার প্ল্যান্ট। তিন দিক থেকে ঘিরে রাখা বন ও পাহাড়ের কোলে ভুটানের সংরক্ষিত জলাধার থেকে জলঢাকা নদীর ওপরে দীর্ঘ বাঁধের খোলা দরজাগুলো দিয়ে বিপুল জলরাশি গর্জন তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে এপারে নদীর বুকে। শুরুতে বড় বড় পাথরের চাঁইয়ের ভেতর দিয়ে পথ কেটে বয়ে গেলেও একটু পরেই নুড়ি পাথরের বিছানায় হামাগুড়ি দিচ্ছে দুধ সাদা জলের প্রবাহ।

দুধ পখরি, বিন্দু এবং জলঢাকা নামের তিন নদীর স্রোতধারাকে যেখানে ইস্পাত আর কংক্রিটের বাধনে আটকে ফেলা হয়েছে, সেই বাঁধের উচ্চতা কতো জানতে না পারলেও খাড়া পাহাড়ি পথে হেঁটে উঠতে দম ফুরিয়ে যাবার যোগাড়। একে একে প্রায় সকলেই উঠে গেলে রেলিং দিয়ে ঘেরা স্টিলের পাত বসানো পথ দিয়ে হেঁটে যাই বাঁধের শেষ প্রান্তে ভুটানের সীমানা পর্যন্ত। ভুটানের পাহাড়ে অরণ্য আরো ঘন, বনের গাছপালা অনেক বেশি সবুজ। সেখানে পাহাড়ের গায়ে রঙিন চালের ছোট ছোট বাড়িতে যারা থাকে, নানা ধরনের নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলেও এই নির্জন প্রকৃতির কোলে তাদের বসবাস কৌতূহল আর মুগ্ধতা জাগায়। ড্যামের উপর থেকে নিচে তাকিয়ে আরো একবার বিস্মিত হতে হয়। সবুজ অরণ্য ঘেরা পাহাড়ি উপত্যকার মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী আর ডান পাশে পাহাড়ি গ্রামের দৃশ্য দেখে কেটে যায় অনেকটা সময়।

এবার ফেরার পালা। পথের দুপাশে সাজানো স্মারক সামগ্রীর দোকানে রঙিন জামা কাপড়, টুপি, ছাতা, পাখা, পুতুল, শীতবস্ত্র এবং ব্যাগসহ ঝুলছে নানা সামগ্রী। খাবারের দোকানগুলো থেকে ভেসে আসছে স্থানীয় খাদ্য সম্ভারের ঘ্রাণ। লোভনীয় সুভ্যেনিয়ার ও খাবারের আমন্ত্রণ এবং পাহাড়ি তরুণীদের আহ্বান সযত্নে এড়িয়ে আমরা আবার বাহনে উঠে বসি। আঠারোজন যাত্রী নিয়ে তিনটি টাটা ইন্ডিকা ছুটতে থাকে পরবর্তী গন্তব্য কালিম্পংয়ের পথে।